রুদ্র শিব ও সদাশিব

ডঃ মধুসূদন কৃষ্ণদাস

<u>(ক) সাধারণ আলোচনা ঃ</u> অনেকে মনে করেন শিবই ভগবান। এক অর্থে এই কথা সত্য। কারণ শিবের ঈশ্বরতা গোবিন্দের ঈশ্বরতার অধীন। বিষ্ণুর সাথে ভেদ এবং অভেদ তত্ত্ব। মায়ার সাথে বিকার লাভ করায় ভেদ এবং চিৎবিলাসের আশ্রয় জাতীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব হওয়ায় বিকার রহিত হয়ে স্বয়ং বিষ্ণুর সাথে অভেদ।

বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভু--ইত্যাদি শাস্ত্র-বচনের তাৎপর্য্য হলো শম্ভু নিজের কাল শক্তি দ্বারা কৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে দুর্গাদেবীর সাথে যুক্ত হয়ে তমোগুণের সাহায্যে সংহার কাজ পরিচালনা করেন। সংহারকর্তা হিসাবে শিব তমোগুণের অবতার। আবার জীবসমূহের অধিকার ভেদে ভক্তিলাভের জন্য ধর্ম শিক্ষা দেন। কোন কল্পে (ব্রহ্মার ১ দিন জড় জগতের ৪৩২ কোটি বছর) সর্বোত্তম পূন্যবান জীবও সংহার কর্তা শিব হন। আবার কোন কল্পে এরূপ জীব না পাওয়া গেলে স্বয়ং ভগবান নিজেই শিবরূপ ধারণ করে সংহার কাজ পরিচালনা করেন। সংহার কর্ত্তা হিসাবে যে শিব তাকে রুদ্র শিব বলা হয়।

কিন্তু যিনি বৈকুণ্ঠের অন্তর্গত শিব লোকে সদাশিব রূপে বিরাজিত তিনি গুণ অবতার নন। তিনি নির্গুণ এবং নারায়ণের মতো স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই বিলাস মূর্ত্তি বা কায়ব্যূহ। তাই সদাশিব গুণ অবতার শিবের অংশী বা গোপালীনি শক্তি। কাজেই ব্রহ্মা থেকে শ্রেষ্ঠ এবং বিষয় আশ্রয়ের অলম্বত্বে একত্ব হেতু বিষ্ণুর সাথে অভিন্ন। এইজন্য শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে--

শিব মায়া শক্তি-সঙ্গী তমোগুণাবেশ।
মায়াতীত গুণাতীত বিষ্ণু পরমেশ।।

<u>(খ) রুদ্র শিব ঃ</u> সদাশিবের যে অংশ তমোগুণকে অঙ্গীকার করে গুণাবতার রূপে জগতে অবতীর্ণ হন তাকে রুদ্র শিব বলা হয়। তিনিই হলেন জড়জগতের সংহার কর্তা। অন্যকথায় রুদ্র হলেন শিবের এক বিশেষ মূর্ত্তি। ব্রহ্মা তাঁর মানস পুত্র সনক, সনাতন, সনন্দন এবং সনৎকুমারকে প্রজা সৃষ্টির আদেশ দিলেন তাঁহার সেই আদেশ না মানায় ব্রহ্মার ভীষণ ক্রোধ উৎপন্ন হয়। সম্বরণ করতে চেষ্টা করলেও ব্রহ্মার ভ্রু থেকে নীললোহিত বর্ণের এক কুমার নির্গত হয়। এই কুমারই দেবগণের পূর্বজ এবং অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন। সৃষ্টির পর পরই রোদন করায় তাঁর নাম হয় রুদ্র।

রুদ্র শিবের ১১ ধরনের রূপ আছে। যথা--অজৈকপাত, অহির্বধ্ন, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, দেবশ্রেষ্ঠ, ত্র্যম্বক, সাবিত্য, জয়ন্ত, পিনাকী এবং অপরাজিত। এদের মধ্যে প্রায় রুদ্রই পঞ্চমুখ, ত্রিনয়ন, এবং দশহাত বিশিষ্ট। আবার একাদশ রুদ্রানী হলেন ঃ ধী, ধৃতি, রসলা, উমা, নিযুৎ, সর্পি, ইলা, অম্বিকা, ইরাবতি, স্বধা এবং দীক্ষা।

রুদ্রশিব মূলত কৈলাস পর্বতে এবং কাশীধামে থাকেন। শ্রীমদ্ ভাগবত (১০/৪০/১৭) থেকে দেখা যায় কৈলাস পর্বত হলো সুমেরুর দক্ষিণে তিব্বতের অন্তর্গত পর্বত। মানস সরোবর এতে অবস্থিত। এখানেই যক্ষদের অধিপতি কুবের এর অবস্থান। কুবের এর প্রার্থনায় এই স্থানে হর-পার্বতী বাস করেন। এছাড়াও মথুরা ধামকে রক্ষার জন্য চারজন ক্ষেত্রপাল বা নগর রক্ষক রূপে রুদ্র শিব বিরাজমান আছেন। তাঁরা হলেন পূর্বদিকে পিপ্পলেশ্বর, পশ্চিমে ভূতেশ্বর, উত্তরে গোকর্ণেশ্বর এবং দক্ষিণে রঙ্গেশ্বর।

আবার পুরীধামে শ্রীজগন্নাথদেবের দ্বারপালরূপ পঞ্চশিবমূর্ত্তি বিরাজমান। এদের মধ্যে কপালমোচন মহাদেব বা শিব হলেন প্রধান। শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ দ্বারের নিকটে এই মহাদেব বিরাজমান। প্রবাদ এই যে পূর্বে ব্রহ্মার পাঁচটি মাথা ছিল। কোন কারণে মহাদেব একটি মাথা ছেদন করলে সেটি তার হাতে সংলংগ্ন হয়ে যায়। তিনি বিভিন্ন জায়গায় ঐ মস্তক নিয়ে ভ্রমণ করে কোথায়ও আশ্রয় না পেয়ে শেষে শ্রীজগন্নাথদেবের শরণ নেন এবং

তাঁর কৃপায় ব্রহ্ম হত্যার দোষ থেকে মুক্ত হন। এইজন্য তিনি কপালমোচন নাম ধারণ করে শ্রীপুরীধামে অবস্থান করছেন।

রুদ্র শিবের পূজায় বেলপাতা, ধুতুরা ফুল, আকন্দ এবং করবী ফুল অবশ্যই প্রয়োজন। রুদ্র শিবের আরেক নাম আশুতোষ অর্থাৎ অতি সহজেই তিনি সন্তুষ্ট হন। কেবলমাত্র বেলপাতা সহ গঙ্গাজলে স্নান করিয়ে তার কাছে সাধারণ মানুষ একটু কাতরভাবে প্রার্থনা করলেই তিনি তা মঞ্জুর করেন বলেই তাঁর নাম আশুতোষ হয়েছে।

রুদ্র শিবের অনুচরগণের মধ্যে নন্দী এবং ভৃঙ্গীই হলেন প্রধান। আবার দক্ষ প্রজাপতির যজ্ঞে তাঁর স্ত্রী সতী অপমানিত হয়ে দেহ ত্যাগ করায় তিনি তাঁর অনুচর বীরভদ্রের সাহায্যে দক্ষের শিরচ্ছেদ করান, এই সম্পর্কিত কাহিনীটি হল ঃ ব্রহ্মার পুত্র -- 'প্রজাপতি দক্ষ' শিবের প্রতি অতি মাৎসর্যপরায়ন ছিলেন। কারণ ছিল শিব ভগবানের গুণাবতার হওয়ার দরুন এবং সরাসরিভাবে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত থাকায় তাঁকে দেবতাদের কোন এক যজ্ঞে বেশী সফল এবং উচ্চতর আসন দেয়া হয়েছিল। দক্ষ সেখানে উপস্থিত হলে নিজের মেয়ে সতীর জামাতা হওয়া সত্ত্বেও শিব তাঁর আসন থেকে উঠে তাকে সম্মান না করায় দক্ষ অত্যন্ত রুষ্ট হন। এছাড়াও দক্ষ ছিলেন অত্যন্ত দাম্ভিক। ফলে শিবের উচ্চ পদ সহ্য করতে পারেন নাই। তাই দক্ষ সুযোগবুঝে একসময় নিজে এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করে সমস্ত দেব-দেবী, ঋষি এবং অন্যান্যদের আমন্ত্রণ করেন। কিন্তু শিবকে এই যজ্ঞে তিনি নিমন্ত্রণ করেন নাই। পিতা কর্তৃক যজ্ঞে নিমন্ত্রিত না হয়েও সতী সেই যজ্ঞে উপস্থিত হন। সতী যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়ে দেখেন যজ্ঞে তাঁর পতি শিবের কোন ভাগ নেই। পিতা দক্ষকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে শিবের প্রতি অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ন হওয়ায় তিনি তার কন্যা সতীকে শিবের নিন্দা শুনিয়ে চরমভাবে অপমান করেন। শিবনিন্দা সহ্য করতে না পেরে সতী দেহত্যাগ করেন এবং সেই সাথে দক্ষ শিবের কোপে পড়ে নিজের মস্তক হারিয়ে ছাগলের মুণ্ড প্রাপ্ত হন। শিব তখন সতীর দেহ নিয়ে তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করেন। এর ফলে ত্রিভুবন ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। তখন দেবতাদের অনুরোধে বিষ্ণু তাঁর সুদর্শন চক্র দ্বারা সতীর দেহের বিভিন্ন অংশ ছেদন আরম্ভ করেন এবং এভাবে সতীর দেহের বিভিন্ন অংশ যে যে স্থানে পতিত হয় সেখানে একটি করে পীঠস্থান সৃষ্টি হয়। এভাবে ৫১ টি পীঠস্থানের জন্ম হয়।

প্রজাপতি দক্ষের শাপে শিবব্রত পরায়ন ব্যক্তি পাষণ্ডীরক্ষায় প্রবিষ্ট হবে এই কথা মনে করে কোন কোন বৈষ্ণব শিব পূজা করেন না। (ভাগবত ৪/২/২৮)। কিন্তু শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (১৩/১৮৬-১৯৭) শিবপূজা করা বৈষ্ণবের কর্তব্য বলে দেখানো হয়েছে। কারণ, শিব একজন পরম বৈষ্ণব। এজন্য বেশীরভাগ বৈষ্ণবই শিব পূজা করেন।

রুদ্র শিবের গলায় একটি সর্পকে পেচানো অবস্থায় থাকতে দেখা যায়। কথিত আছে যে, পবিত্র নামক একটি সাপ ১০,০০০ বছর ধরে শিবের আরাধনা করে। শিব এতে সন্তুষ্ট হয়ে তার কি প্রয়োজন জিজ্ঞাস করেন। তখন ঐ সাপটি এই বলে প্রার্থনা করে যে, সে শিবের গলায় যেন অবস্থান করতে পারে। সেই থেকেই পবিত্র নামের এই সর্প শিবের গলায় অবস্থানের সুযোগ লাভ করে। রুদ্র শিব তাঁর গলায় আবার রুদ্রাক্ষ দ্বারা নির্মিত মালা পরিধান করেন। গায়ে ছাই ভস্ম মাখেন, বাঘের ছাল পরিধান করেন। হাতে থাকে ত্রিশূল আর পাশুপত এবং শিবজ্বর হল তাঁর প্রধান অস্ত্র।

<u>(গ) সদাশিব ঃ</u> সদাশিব গুণ অবতার রুদ্র শিব থেকে ভিন্ন। তিনি ভগবান সংকর্ষণ থেকে সৃষ্ট। সদাশিব রামনামের উপাসক। গলায় তিনি তার গুরুঃ শ্রীঅনন্তদেবকে সব সময় ধারণ করে আছেন। অনন্তদেব হলেন সংকর্ষণ দেবের আর এক রূপ। তাই বলা যায় তিনি তাঁর গুরুদেবকে কণ্ঠে ধারণ করে আছেন। তিনি মায়ার অধীন নন, এবং মায়াধীশ। তিনি গঙ্গাকে অর্থাৎ বিষ্ণুর পাদোদক মাথায় ধারণ করে রয়েছেন।

চৌদ্দ ভুবনের অন্তর্গত দেবী ধামের উপরে সদা শিবের ধাম নামে একাংশ অন্ধকারময়, সেই অংশ ভেদ করে

মহা আলোকময় সদাশিবলোক। এই শিবধামে মহাদেব কর্পূরের ন্যায় গৌরবর্ণ, ত্রিনয়ন বিশিষ্ট, দিগম্বর, কপালে দীপ্তিমান অর্ধচন্দ্র --অতি সুপুরুষরূপে বিরাজমান। তাঁর হাতে ত্রিশূল, মাথায় জটা, গঙ্গা জলে অম্লান, গায়ে ভস্ম এবং তিনি বৈষ্ণব চূড়ামণিবৃন্দের অস্থিদ্বারা (হাড় দ্বারা) নির্মিত মালা গলায় ধারণ করেন। শ্রী গৌড়ী তাঁর কোলে বসে তাঁর সেবা করেন।

শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম হওয়ায় সদাশিবকে উপাসনা করেন। তিনি দ্বাদশ মহাজনদের অন্যতম। শ্রী সদাশিব শ্রীবিষ্ণুর প্রিয়তম। তাঁর সেবা করলে শ্রীবিষ্ণু সুখী হন--এই বিচারে ভক্তগণ শ্রী সদাশিবের আরাধনা করে থাকেন। ভগবান বলেছেন, 'আমার চেয়ে আমার ভক্তের সেবা ও পূজা বড়।' এই অর্থে শ্রীকৃষ্ণের সেবা অপেক্ষা কৃষ্ণ ভক্ত শিবের পূজা বড় এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কৃষ্ণ সেবায় উদাসীন হয়ে বা কৃষ্ণের সেবার বিদ্বেষী হয়ে শ্রীশিবের সেবা করলে তা হবে পূজার নামে ছলনা ও পাষণ্ডতা। এই ধরণের পাষণ্ডতা এবং কপটতা হৃদয়ে ধারণ করে যারা শিব পূজার ছলনা করে তারা মূলত শিব-বিদ্বেষী। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে বলা হয়েছে--

অতএব সর্ব্বাদ্যে শ্রীকৃষ্ণে পূজি তবে।
প্রীতে শিবপূজি, পূজিবেক সর্ব্বদেবে।।

যেখানে শিব পূজার ফলে কৃষ্ণপ্রীতিতে সিদ্ধি লাভ না হয় সেখানে সেরূপ কল্পিত শিবের বৈষ্ণবত্ব নেই। সেরূপ কল্পিত শিবের পূজা বৈষ্ণব পূজা নয়, বরং অবৈষ্ণব পূজা, অবৈধ এবং অশাস্ত্রীয় পূজা। তাই প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণে ফল-মূল, অন্ন ব্যঞ্জনাদি নিবেদন করে সেই কৃষ্ণ প্রসাদ দ্বারা শিবের পূজা করে সেই মহাপ্রসাদ কৃষ্ণভক্তগণ পেতে পারেন মাত্র।

(ঘ) সদাশিব এবং রুদ্রশিবের মধ্যে পার্থক্য ঃ

সদাশিব এবং রুদ্রশিবের মধ্যে নিম্নোক্ত পার্থক্য আছে।

১। সদাশিব ভগবান সংকর্ষণ থেকে উদ্ভুত। রুদ্র শিব ব্রহ্মার ভ্রূযুগল থেকে উৎপন্ন।

২। শ্রী সদাশিব রুদ্র শিবের অংশী। অর্থাৎ সদাশিবের অংশই হলেন রুদ্রশিব। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে--

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র- সদাশিবের অংশ।
গুণাবতার তেঁহো সর্ব্বদেব অবতংস।।

৩। সদাশিব গুণাতীত, মায়াধীশ। অর্থাৎ সত্ত্ব-রজ এবং তমোগুণের অতীত এবং মায়ার অধীন নন। রুদ্রশিব হলেন তমঃগুণের আধার, তাঁর সঙ্গী হলেন মায়া বা মহাকালী। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে।

নিজাংশ-কলায় কৃষ্ণ তমো-গুণ অঙ্গীকারে।
সংহারার্থে মায়া সঙ্গে রুদ্র-রূপ ধরে।।
মায়া সঙ্গ বিকারে, রুদ্র-ভিন্নাভিন্ন রূপ।
জীবতত্ত্ব হয়, নহে কৃষ্ণের স্বরূপ।।

চৈঃ চঃ মধ্য ২০/৩০৭-৩০৮)

৪। সদাশিব বৈকুণ্ঠের অন্তর্গত শিবলোকে শ্রীভগবানের নিত্যসেবকরূপে বিরাজমান। আর ব্রহ্মাণ্ডে প্রলয়কাল পর্যন্ত কৈলাস ও কাশীধামে যিনি বিরাজ করেন তিনি রুদ্রশিব। তিনি তমোগুণের প্রধান দেবতা এবং তার এই রূপ মহা প্রলয়ের সময় তিরোহিত হয়।

৫। ধরা ধামের মধ্যে মূলত কৈলাস এবং কাশী ধামে রুদ্রশিব বিরাজ করেন। আর সদাশিব হলেন পরম বৈষ্ণব রূপে বিরাজিত। তিনি শ্রীবৃন্দাবনের ক্ষেত্রপাল হিসাবে নিয়োজিত। ইনি গোপীগণকে আরাধনা করত রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার বাসনায় বৃন্দাবনে অবস্থান করছেন।

(ঙ) রুদ্র শিব এবং সদাশিব সম্পর্কিত কাহিনী ঃ

রুদ্র শিব সহজেই সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর আরাধনায় রত যে কোন জীবকে প্রার্থিত বর প্রদান করেন। এর সুযোগ নিয়ে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই রাজসিক এবং তামসিক মনোভাবাপন্ন অসুর এবং দৈত্যরা রুদ্র শিবের ভজনা করতে আগ্রহী হয়। অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করেই স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে রুদ্র শিব তাঁর ভক্তকে বরদান করে বসেন। আর এভাবে বরদান করার ফলে অনেক সময় নিজেই বিপদে পড়ে যান এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নিজের জীবন বাচানোর জন্য বিষ্ণুদেবের শরনাপন্ন হতে

বাধ্য হন। এরূপ একটি কাহিনী হল ঃ এক সময়ে একজন অসুর শিবের আরাধনা করতে শুরু করে। উদ্দেশ্য ছিল কিছু বর প্রার্থনা করে নিজের ক্ষমতা বাড়ানো। বেশ কিছুকাল আরাধনা করার পর শিব তাকে দর্শন দিয়ে জিজ্ঞেস করেন তার কি প্রয়োজন ঐ অসুর তখন শিবকে বলেন-- সে যার মাথায় হাত দিবে সে যেন তৎক্ষণাৎ ভস্মহয়ে যায় এবং এই কারণে তার নাম যেন ভস্মাসুর হয়। এই ধরণের বর প্রদানের ফল যে কি হতে পারে তা বিচার-বিবেচনা না করেই শিব বললেন তথাস্তু অর্থাৎ তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর হলো।

এই অসুর ছিল তমসাচ্ছন্ন। এর ফলে এই বরের কার্যক্ষমতা পরীক্ষার জন্য সে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। কাউকে সামনে না পেয়ে সে চিন্তা করলো শিবের মাথায় হাত দিয়ে দেখিতো কেমন হয়? যেই ভাবা সেই কাজ। সে শিবকে বললো আপনার মাথায় হাত দিয়ে দেখি। একথা শুনেই শিব পালাতে লাগলেন। আর অসুরও তার পিছনে ছুটলো। শিব ছুটতে ছুটতে প্রথমে ব্রহ্মার কাছে এসে তাঁর বিপদের কথা বলে তাকে রক্ষা করতে বললেন। সব শুনে ব্রহ্মা তাকে বললেন যে তার পক্ষে শিবকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। তিনি যেন ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। ইতিমধ্যে অসুরও সেখানে পৌছে গেছে। তাকে দেখেই শিব ছুটতে ছুটতে বৈকুণ্ঠে এসে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। সব কথা শুনে বিষ্ণু তাকে আশ্বাস দেন। এই অবসরে ঐ অসুরও সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়। বিষ্ণু তাকে দেখে কোমলভাবে জিজ্ঞেস করেন কি হয়েছে? তুমি শিবকে তাড়া করছ কেন? অসুর তখন সব ঘটনা খুলে বলে। তখন বিষ্ণু ঐ অসুরকে বলেন যে শিব হলো গাঁজা, ভাঙ্ ইত্যাদি খায়। শশ্মানে ঘুরে বেড়ায়, ভূত-প্রেত ইত্যাদি হলো তার নিত্যসঙ্গী। তাঁর কথার দাম কি? তাই এতদূরে আসার কোন দরকারই ছিল না। তুমি নিজেই তো নিজের মাথায় হাত দিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পারতে। বোকা অসুর বিষ্ণুর মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে নিজের মাথায় নিজের হাত রাখলো। এর ফলে সে তৎক্ষণাৎ ভস্ম হয়ে গেল।

আবার বানাসুর--যে প্রহ্লাদ মহারাজের বংশধর- সে শিব ভক্ত ছিলো। তার আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করে রুদ্র শিব তাকে এমন বর প্রদান করে যেন বানাসুর সহস্র হাতের অধিকারী হয়। আর শিবের বরে সহস্র হাত পেয়ে বানাসুর অত্যন্ত অত্যাচারী হয়ে উঠে। এই বানাসুরের এক কন্যা ছিল। তার নাম ছিল উষা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধকে সে ঘটনাচক্রে স্বপ্নেদেখে ভালবেসে ফেলে। উষা তার সখী চিত্রলেখার সাহায্যে যোগবলে অনিরুদ্ধকে বনাসুরের রাজধানী শোনিতপুরে নিয়ে আসে। গোপনে তারা পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। একসময় বানাসুর এই ঘটনা জানতে পেরে অনিরুদ্ধকে কারাগারে আবদ্ধ করে রাখে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একথা জানতে পেরে বানাসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন। বানাসুর তখন শিবকে তার পক্ষ হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য প্রার্থনা করলে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে শিব ঐ যুদ্ধে যোগদান করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাথে এক পর্যায়ে শিবের যুদ্ধ হয়। শিব পাশুপত অস্ত্র প্রয়োগ করলে ভগবান তাঁর সুদর্শন চক্র দ্বারা সেটিকে ব্যর্থকরে দেন। অবশেষে শিব তার শেষ অস্ত্র হিসাবে শিবজ্বর নামক এক অস্ত্র প্রয়োগ করেন। এই অস্ত্রের তাপ ছিল ভয়াবহ। একে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য ভগবান তখন তাঁর নারায়ণ জ্বর নামক অস্ত্র নিক্ষেপ করেন। এই অস্ত্র অত্যন্ত শীত উৎপন্ন করতে পারতো। ফলে শিবের শিবজ্বর অস্ত্র ব্যর্থ হয়। আর ইতিমধ্যে সুদর্শন চক্রদ্বারা ভগবান বানাসুরের সহস্র হাত কাটা আরম্ভ করেন এবং ৯৯৬ টি হাত কেটে ফেলেন। পরে শিব কৃষ্ণের স্তব-স্তুতি আরম্ভ করেন এবং তার অনুরোধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বানাসুরের বাকী ৪টি হাত রেখে দেন। এভাবে ভক্ত হলেও রুদ্র শিবকে নিজের শিষ্য বানাসুরের জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়।

আগেই বলা হয়েছে যে সদাশিব শুদ্ধ বৈষ্ণব ভক্তের অস্থিদ্বারা গাথা মালা গলায় পরিধান করে থাকেন। বৈষ্ণবানাং যথাসম্ভু অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব হওয়ায় তিনি ভক্তদের হৃদয়ে কৃষ্ণ প্রেম জাগরিত করেন। শুদ্ধ বৈষ্ণবের সব কিছুই তাঁর কাছে প্রিয়। এই সূত্রে মহাভারতে বর্ণিত

একটি কাহিনী এখানে উল্লেখ করা যায়।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর পাণ্ডবরা একসময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদন ক্রমে অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করে। যজ্ঞের ঘোড়ার রক্ষণাবেক্ষনে অর্জুনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই অশ্ব বিভিন্ন দেশ ঘুরে একসময় ময়ূরধ্বজ নামক এক রাজার রাজ্যে উপনীত হয়। রাজা অশ্বের কপালের লিখন পড়ে জানতে পারলেন যে পাণ্ডবরা এই অশ্বমেধ যজ্ঞ করছেন। এই রাজা, তার পুত্র হংসধ্বজ এবং পরিবার পরিজন সবাই ছিলেন পরমবৈষ্ণব অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঐকান্তিক ভক্ত। রাজা তখন চিন্তা করলেন এই অশ্বটিকে আটকিয়ে রাখতে হবে। এর ফলে অর্জুনের সাথে তাদের যুদ্ধ হবে। অর্জুনকে যুদ্ধে হারাতে পারলে ঐ সময় তার সাহায্যে নিশ্চয়ই ভগবান কৃষ্ণ আসবেন। আর সেই সুযোগে প্রাণভরে কৃষ্ণের কমল মুখ দেখার পাশাপাশি তাঁর এবং সখা অর্জুনেরও সেবা করার সুযোগ পাওয়া যাবে। এই চিন্তা করে ময়ূরধ্বজ তার পুত্র হংসধ্বজকে অশ্বটিকে আটকাতে বললেন।

অশ্বকে আটকিয়ে রাখা হয়েছে এই খবর পেয়ে অর্জুন ময়ূরধ্বজ রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। রাজ পুরোহিতের পরামর্শে রাজা ঢেড়া পিটিয়ে দিলেন এই বলে যে, রাজ্যের সব সমর্থবান ব্যক্তিদেরকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে হবে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হতে হবে। এই ব্যাপারে কেউ ব্যর্থ হলে তাকে তপ্ত তৈলে নিক্ষেপ করা হবে।

যাই হোক কোন কারণবশত রাজপুত্র হংসধ্বজ ঘোষিত সময়সীমার মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হন। এর ফলে তাকে তপ্ত তৈলে নিক্ষেপ করার কথা ঘোষণা করা হয়। পরম বৈষ্ণব হওয়ায় হংসধ্বজ তার দ্বাদশ অঙ্গে তিলক অঙ্কন করে বিষ্ণু বিষ্ণু বলে তপ্ত তৈল পাত্রে উপবেশন করেন এবং সেই সময় থেকেই একমনে ভগবান বিষ্ণু তথা কৃষ্ণকে আকুল মনে স্মরণ করতে থাকেন। কৃষ্ণের কৃপায় আশ্চর্য্যজনক ভাবে সেই তপ্ত তৈল শীতল তৈলে রূপান্তর হয়ে যায় এবং সেখানে বসেই সে অনবরত উচ্চস্বরে ভগবানের নাম করতে থাকে। হংসধ্বজের এইভাবে বেঁচে যাওয়ায় রাজা তখন তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে হংসধ্বজের সাথে পাণ্ডব বাহিনীর কোন যোদ্ধাই টিকে থাকতে সমর্থ হলেন না। উপায়ন্তর না দেখে শেষ পর্য্যন্ত মহাবীর অর্জুন নিজেই এগিয়ে আসেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর হংসধ্বজ পরাজিত অথবা নিহত না হওয়ায় এবং হংসধ্বজের বাণে প্রাণ সংশয় দেখে অর্জুন শেষ পর্য্যন্ত ভয়ে তার সখা কৃষ্ণকে আকুলভাবে স্মরণ করেন। আর স্মরণ করা মাত্রই অর্জুন দেখতে পেলেন যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার রথের সারথী হয়ে বসে রয়েছেন। এদেখে অর্জুনের মনে আবার সাহস এবং বল ফিরে আসে। তিনি পূর্ন্যোদ্দমে হংসধ্বজের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। যুদ্ধের এক পর্য্যায়ে অর্জুন একটি বাণ মেরে হংসধ্বজের রথকে ১০ যোজন (১ যোজন = ৮ মাইল) দূরে সরিয়ে দেন। এই সময় অর্জুনের মনে অহংকার জন্মে এবং সেই সূত্রে তিনি কৃষ্ণকে দম্ভভরে বলেন, কৃষ্ণ! দেখলেতো হংসধ্বজকে কেমন জব্দ করলাম? কৃষ্ণ দেখলেন অর্জুনের মনে অহংকার হয়েছে। ভগবানকৃষ্ণ অহংকারীর অহংকার দূর করেন। তিনি বললেন পাখি রথে থাকা সত্ত্বেও দেখ হংসধ্বজ তোমার রথকে ১০ যোজন দূরে নিক্ষেপ করতে সক্ষম হয়েছে। আমি তোমার রথ থেকে নেমে যাই। দেখি তুমি কিভাবে তোমার রথ রক্ষা করতে পার। এই বলে ভগবান রথ থেকে নেমে গেলেন। তখন হংসধ্বজ এক বাণ মেরে অর্জুনের রথকে ৮০ যোজন (৬৪০ মাইল) দূরে নিক্ষেপ করলেন। অর্জুনের তখন দুঃখ হলো। তিনি ফিরে এসে কৃষ্ণের কাছে ক্ষমা চাইলেন এবং তাঁকে পুনরায় রথের সারথী হতে সবিনয় অনুরোধ করলেন। ভক্ত বৎসল ভগবান আবার রথের সারথী হলেন।

এইভাবে যুদ্ধ চলছে। কেউ কাউকে হারাতে পারছে না। অর্জুন যত কঠিন কঠিন বাণ হংসধ্বজের দিকে ছুড়ছেন, হংসধ্বজ অতি সহজেই সেগুলো ব্যর্থ করে দিচ্ছেন। এতে অর্জুনের মনে ক্ষেদ হয় এবং কৃষ্ণকে লক্ষ্য করে বলেন, হে সখা, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তোমার কৃপায়

কত বড় বড় রথী মহারথীকে আমি পরাজিত এবং নিহত করতে পেরেছি, অথচ এই যুবকের কিছুই করতে পারছি না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তুমি আমার সব প্রতিজ্ঞাই রক্ষা করেছো। তাই তোমার সামনে আমি এই প্রতিজ্ঞা এখন করছি যে এই বাণেই যেন হংসধ্বজের মাথা কাটা যায় এবং সে নিহত হয়। এই বলে হংসধ্বজকে লক্ষ্য করে একটি অর্ধচন্দ্র বাণ নিক্ষেপ করে তাকে বললেন যে এই বাণেই তার মুণ্ডু কাটা যাবে। হংসধ্বজ তখন ভগবানকে স্মরণ করে বললেন যে, এই বাণ দ্বারাই সে অর্জুনের বাণকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলবে। উভয় ভক্তের প্রতিজ্ঞা শুনে ভগবান কৃষ্ণ হাসলেন। এই সময় হংসধ্বজের নিক্ষিপ্ত বাণ অর্জুনের নিক্ষিপ্ত অর্ধচন্দ্র বাণকে দ্বিখণ্ডিত করে দেয় এবং বাণটির উভয় অংশই ভূমিতে পতিত হয়। এই দেখে হংসধ্বজ হাসতে থাকেন এবং ভগবানের সামনেই তাঁকে নানা বাক্যে পরিহাস করতে থাকেন। অর্জুনের মন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে এবং তিনি বিষন্ন চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের করুণা প্রার্থনা করতে থাকেন। ভগবানের কি মহিমা! অর্জুনের নিক্ষিপ্ত বাণের অর্ধাংশ আকাশে উঠে আসে এবং একসময় হংসধ্বজের মুণ্ড কর্তন করে দেয়। ভগবান তাঁর ভস্ম হংসধ্বজের মস্তক সহ দেহটিকে গঙ্গা যমুনা এবং সরস্বতী নদীর সঙ্গম স্থলে ফেলার জন্য শ্রীগড়ুরদেবকে নির্দেশ দেন। এদিকে মহেশ ধামে অবস্থানরত সদাশিব ও তার অনুচর নন্দীকে পরম বৈষ্ণব হংসধ্বজের দেহ আনার জন্য আদেশ প্রদান করেন এবং তাকে নিজের ত্রিশূল প্রদান করেন। নন্দীর একটি বড় গুণ ছিল এই যে, তিনি ইচ্ছামতো তার শরীরের যে কোন অঙ্গকে প্রসারিত করতে পারতেন। বিষ্ণুর বাহন গড়ুরদেব হংসধ্বজের দেহ নিয়ে ত্রিবেণীর দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। আর সদাশিবের নির্দেশে নন্দীও সেই দেহ পাওয়ার জন্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হন। মহা বলবান নন্দীকে দেখে গড়ুর ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠতে থাকেন। আর নন্দীও এতই লম্বা হতে থাকেন। একসময় অতি কষ্টে শ্রীগড়ুরদেব ত্রিবেণীতে পৌছে হংসধ্বজের দেহ নীচে ফেলে দেন। কিন্তু ঐ সময়ই নন্দী তার দুই হাত প্রসারিত করে সেটিকে ধরে ফেলেন। হংসধ্বজের দেহ মহেশ ধামে পৌছলে সদাশিব আনন্দে নৃত্য করতে থাকেন। এরপর হংসধ্বজের দেহের অস্থি সমূহ সদাশিব তার গলার মালায় সংযুক্ত করেন। আর হংসধ্বজের মাথার খুলিটি নিজের কাছে রেখে দেন যাতে জল ভিক্ষা পেলে তিনি সেটিতে জল ভরে জল খেতে পারেন। এভাবে সদাশিবের শুদ্ধ বৈষ্ণব প্রিয়তার কথা বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।